চর্যাপদ: আধুনিক আলোয় ফিরে দেখা

By Prof. Tumtum Mukherjee

বি.এ(1st Sem)

Date of Lecture :০৯/০৮/১৮

চর্যাপদ নিয়ে প্রথম এবং চরমতম কথা হল, এটা বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম, এবং বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনযুগের একমাত্র নিদর্শন। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনযুগের এই একটাই নিদর্শন পাওয়া গেছে; তবে তার মানে এই নয়, সে যুগে বাংলায় আর কিছু লেখা হয়নি। হয়তো লেখা হয়েছিল, কিন্তু সংরক্ষিত হয়নি। সে নিয়ে পরে আলোচনা করা যেতে পারে। আপাতত চর্যাপদ সম্পর্কিত কিছু বেসিক তথ্য দেয়া যাক।

চর্যাপদ রচিত হয় ৮ম থেকে ১২শ শতকের মধ্যে। এ নিয়ে বেশ বিতর্ক আছে, তবে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য মত এটাই। এটি মূলত বৌদ্ধসহজিয়া বা বৌদ্ধতান্ত্রিক সাধকদের সাধনসঙ্গীত।

বইটিতে মোট চর্যা বা পদ বা গান আছে ৫১টি। এর মধ্যে ১টি পদের টীকা বা ব্যাখ্যা দেয়া নেই। ৫১টি পদের মধ্যে পাওয়া গেছে সাড়ে ৪৬টি; একটি পদের অর্ধেক পাওয়া গেছে।

চর্যাপদের মোট কবি ২৩জন। এনিয়েও বিতর্ক আছে; যেমন অনেকেই বলেন দারিকপা আর দাড়িম্বপা আলাদা ব্যক্তি, কিন্তু গ্রহণ যোগ্য মত হল, এই দুই জন একই ব্যক্তি। এভাবে একেক জনের গণনায় কবির সংখ্যা একেক রকম; তবে গ্রহণ যোগ্য মত ২৩জন।

চর্যাপদের প্রাচীনতম কবি সরহপা। অনেকে দাবি করেন, লুইপা সবচেয়ে পুরোনো; তাদের এই ধারণার পক্ষে প্রমাণ, চর্যার প্রথম পদটি তার রচিত, এই প্রমাণের ভিত্তিতে তাকে আদিকবি'ও বলা হয়। কিন্তু পরে এটা প্রমাণিত হয়েছে, চর্যাপদের কবিদের মধ্যে প্রাচীনতম কবি সরহপা-ই। আর সবচেয়ে বেশি পদ লিখেছেন কাহ্নুপা, ১৩টি। সরহপা লিখেছেন ৪টি পদ। ভুসুকপা লিখেছেন ৮টি, কুক্কুরীপা ৩টি, লুইপা, শান্তিপা আর সবরপা ২টি করে। বাকি সবাই ১টি করে পদ লিখেছেন।

চর্যাপদ নিয়ে সবচেয়ে জনপ্রিয় বিতর্ক হল, এটি কোন ভাষায় রচিত। এটা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে, এবং এই বিতর্কের কোন শেষ হবে বলে ভাবারও কোন অবকাশ নেই। আমরা যেমন দাবি করি এর ভাষা বাংলা, তেমনি অসমিয়ারাও দাবি করে এর ভাষা অসমিয়া, মৈথিলিরাও দাবি করে এর ভাষা মৈথিলি, উড়িয়ারাও দাবি করে এর ভাষা উড়িয়া। এমনি দাবি করে মগহি, ভোজপুরিয়া আর নেওয়ারিরাও। কেবল হিন্দি ভাষীদের দাবিই উড়িয়ে দেয়া যেতে পারে।

সমস্যাটা বুঝতে হলে এই অঞ্চলের ভাষার বিবর্তন সম্পর্কে কিছুটা জানা থাকা দরকার। এই লেখায় সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করছি না, সেটি ভিন্ন আলোচনা; কেবল এই তথ্যটা জানা জরুরি, তখনো বাংলা ভাষা পুরোপুরি স্বতন্ত্র ভাষা হয়ে ওঠে নি, বরং স্বতন্ত্র একটি ভাষা হয়ে উঠছে। এর কেবলই কিছু আগে বাংলা ভাষা থেকে আলাদা হয়েছে উড়িয়া ভাষা। তখনো মৈথিলি আর অসমিয়া বাংলা থেকে পুরোপুরি আলাদা হয়ে স্বতন্ত্র ভাষা হয়ে ওঠেনি; মৈথিলি পুরোপুরি আলাদা হয়েছে তের শতকে, অসমিয়া আলাদা হয়েছে ষোল শতকে। (ভাষা আলাদা হওয়ার ব্যাপারটা বোঝানো একটু কষ্টকর, এখানে তাই জটিলতা টুকু পরিহার করলাম) এই অঞ্চলের অন্যান্য ভাষাগুলোও বাংলা থেকে পুরোপুরি পৃথক হয়েছে খুব বেশিদিন হয়নি; ফলে চর্যার ভাষায় এই সব ভাষারই কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। আর উড়িয়া, মৈথিলি আর অসমিয়া, বিশেষ করে শেষ দুটি ভাষার বৈশিষ্ট্য চর্যাপদে বেশ ভাল ভাবেই বিদ্যমান। ফলে চর্যাপদের উপর এই ভাষাগুলোর দাবি কোন ভাবেই নস্যাৎ করে দেয়া যাবে না। তবে এ ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই, চর্যাপদ আমাদেরও সম্পদ।

চর্যাপদের ভাষা সম্পর্কে বেশ ভাল একটা উপসংহার টেনেছেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ; তিনি এর ভাষার নাম দিয়েছেন বঙ্গ-কামরূপী, বা প্রত্ন-বাংলা-আসামি-উড়িয়া-মৈথিলি ভাষা।

ভাষার প্রসঙ্গ গেল, এখন আলোচনা করা যাক চর্যাপদ রচনার কারণ কী।এটা আগেই বলা হয়েছে, চর্যাপদ মূলত

বৌদ্ধসহজিয়াদের বা তান্ত্রিকদের সাধনসঙ্গীত। কিন্তু এই বৌদ্ধ সহজিয়া কারা? সেক্ষেত্রে আমাদেরকে এই অঞ্চলের মানুষের বিশ্বাসের বা ধর্মের ইতিহাস একটু হলেও আলোচনা করতেই হবে।

এই অঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসীদের নিজস্ব ধর্ম বা বিশ্বাস ছিল। সেই বিশ্বাসে প্রথম পরিবর্তন আসে আর্যদের আগমনের ফলে। কিন্তু তখনো বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়নি। বাংলা ভাষার উদ্ভবের অনেক আগেই বুদ্ধ এসেছেন, বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তন করেছেন।এই অঞ্চলের মানুষ তখন ছিল মূলত বৌদ্ধ।কিন্তু নতুন ধর্ম কখনোই পুরোনো ধর্মের প্রভাব এড়াতে পারেনা, বৌদ্ধ ধর্মও পারেনি।ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের বৌদ্ধ ধর্ম বিভিন্ন রকম হয়ে পড়ে।তখনকার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদেরকে মোটমাট ১০টি শাখায় বিভক্ত করা হয়, এই শাখাগুলোকে বলা হয় যান ।মোটা দাগে ধরলে, শাখা ছিল দুটি- মহাযান ও হীনযান বা সহজযান।মহাযানীরা ছিল মূলত চীন, জাপান, কোরিয়া, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসী; আর আমাদের উপমহাদেশের বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা ছিল মূলত হীনযানী বা সহজযানী।এই ধারার বৌদ্ধ সাধকরাই আমাদের আলোচ্য সহজিয়া সাধক বা সহজিয়া তান্ত্রিক।

এই সহজিয়াতান্ত্রিকদের নিজস্ব সাধনসঙ্গীত ছিল, যেগুলোতে গুরুরা তাদের তন্ত্র সাধনার মন্ত্র গোপনে বেঁধে রাখতেন। কেবল যারা তান্ত্রিক সাধনা করে, তারাই সেই মন্ত্র বুঝতে পারবে, অন্যদের কাছে সেটা সাধারণ গানের মতোই অর্থ বহ মনে হবে। এইরকম গানেরই উদাহরণ আমাদের চর্যাপদের পদগুলো। গানগুলোর দুটো অর্থ থাকে, একটি সবাই বুঝলেও আসল যে অর্থ, তান্ত্রিক সাধনার গোপন মন্ত্র, সেটা তান্ত্রিকরা ছাড়া অন্যেদের পক্ষে বোঝা মুশকিল; অন্তত বুঝতে হলে তান্ত্রিক সাধনা সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার। অর্থের এরকম দুর্বোধ্যতা, বোঝা গিয়েও বুঝতে না পারার কারণে এর ভাষাকে বলা হয়েছে সন্ধ্যাভাষা বা সন্ধাভাষা। অনেকে একে বলেছেন আলো-আঁধারির ভাষা।

এই রকম আরো গানের দেখা পাওয়া যায় নেপালে তিব্বতে। কেন এই গানগুলো আমাদের অঞ্চলে নেই, আর নেপালে তিব্বতে এই ধারার গান এখনো টিকে আছে (এই ধারার গান সেখানে বজ্রাগান নামে পরিচিত), তারও একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

একাদশ শতকের শেষে বাংলায় পালসাম্রাজ্যের পতন হয় সেনদের হাতে। মানে, বৌদ্ধ রাজের পতন হয়, হিন্দু রাজ শুরু

হয়। ফলে স্বভাবতই, দেশের বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিধর্মী সম্রাটের প্রতি ভয় কাজ করে। আর মধ্যযুগে (আধুনিক যুগেও নয় কী?) স্বভাবতই রাজধর্মের বেশ প্রভাব ছিল। ফলে অপেক্ষাকৃত ধনী বৌদ্ধরা চলে যায় উত্তরে, নেপাল ভূটান তিব্বতে। আর যাদের সেই সামর্থ্য নেই, তাদের বড়ো অংশই হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে যায়। এদের একটা বড়ো অংশই পরবর্তীতে মুসলিম শাসনা মলে মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়। ফলে ঐ বৌদ্ধদের সাথে বৌদ্ধ তান্ত্রিক দের গানগুলো ও চলে যায় নেপালে তিব্বতে। সেখানে যে আগে এই গানগুলোর চর্চা ছিল না, তা নয়; তবে বৌদ্ধদের মূল শিক্ষাকেন্দ্র ছিল এই অঞ্চলেই, এখানকার বৌদ্ধ বিহারগুলো। কিন্তু এই পালা বদলের পর এই ধারার গানগুলোর বাহন ভাষারও পরিবর্তন ঘটল; এই অঞ্চলের ভাষায় এ ধারার গান রচনা বা গীত হওয়াও বন্ধ হয়ে গেল; এধারার গানের বাহন হয়ে উঠল মূলত তিব্বতি ভাষা।

এই একই কারণে চর্যাপদের পুঁথিটি পাওয়া গেছে নেপালে, বাংলায় বা বাংলার আশেপাশে নয়। এবং একই কারণে বাংলায় এ ধরনের আর কোন পুঁথি ও পাওয়া যায়নি, হয় তো সে গুলো ও নেপালে তিব্বতে চলে গিয়েছিল, সেখানে কেউ সেগুলো সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেনি।

আরেকটি তথ্য, চর্যাপদের যে পুঁথি পাওয়া গিয়েছিল, তাতে ছিল সাড়ে ৪৬টি পদ, কিন্তু আমরা জানি, চর্যাপদের মোট পদ ৫১ টি। এমনকি একটি পদ টীকা না করা, সেটিও জানি। কিন্তু কীভাবে?

এসব তথ্য জানা গেছে চর্যাপদেরই তিব্বতি সংস্করণের মাধ্যমে। সেখান থেকেই জানা গেছে টীকাকারের নাম মুনি দত্ত।তিনি সম্ভবত প্রচলিত চর্যা গান গুলো থেকে এই ৫১ টি গান বা পদ বাছাই করেছিলেন। এবং সেগুলোর টীকাও করেছিলেন। টীকা করার সময় একটি পদের টীকা করার প্রয়োজন বোধ করেননি।

আশা করি, উপরের আলোচনায় চর্যাপদ কী, কেন রচতি হয়েছিল, এবং আমাদের ইতিহাসে এর যে গুরুত্ব আছে- এ সকল ব্যাপার কিছুটা হলেও পরিস্কার হয়েছে।